International Research Journal of Interdisciplinary & Multidisciplinary Studies (IRJIMS)
A Peer-Reviewed Monthly Research Journal
ISSN: 2394-7969 (Online), ISSN: 2394-7950 (Print)
Volume-II, Issue-IV, May 2016, Page No. 14-20
Published by: Scholar Publications, Karimganj, Assam, India, 788711
Website: http://www.irjims.com

প্রতিবাদী আদিবাসী ও শোষিত অন্ত্যজ নারীঃ মহাশ্বেতা দেবীর গল্পে

কৌশিকোত্তম প্রামানিক
গবেষক, বেনারস হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়

Abstract

Mahasweta Devi is a prominent novelist as well as short story writer in Bengali literature. She emerged in Bengali literature in 1956 by writing 'Jhasir rani ', an autobiographical fiction. Besides her novel she wrote many short stories wherein we find many tribal and subaltern women characters who always remonstrate against their social and sexual exploitation or deprivation. In her short story 'Droupadi`, Shikar` we draw up the main protagonist two tribal characters who protest against their sexual exploitation. But in her ``Bayen` 'Rudali' 'Dhouli' she left a big questions about social stigma against subaltern women. Where we find three main subaltern women characters who are victimized by social exploitation of upper caste in the form of sexual abuse or suppression. This is the main thrust of this article.

Key words- sexual exploitation, deprivation, suppression, existential crisis, remonstrate.

বাংলা সাহিত্যে ছোটগল্প নামক সাহিত্য প্রকরণটির যথার্থ রচনার সূত্রপাত হয় রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের হাত ধরে।রবীন্দ্রনাথের হাতে অন্ত্যজ শ্রেণির উপর উচ্চবর্ণের শোষণকে কেন্দ্র করে কিছু গল্প গড়ে উঠেছে। কিন্তু সজীব অন্ত্যজ শ্রেণির চরিত্র রবীন্দ্র গল্পে এককথায় নেই বললেই চলে। কালক্রমে উনবিংশ শতাব্দীর তৃতীয় দশকে বাংলা সাহিত্যে কল্লোল গোষ্ঠীর লেখকদের পদার্পণে বাংলা উপন্যাস ও ছোটগল্পে ভিড় করে এলো অন্ত্যজ শ্রেণির মানুষেরা। যতদূর জানা যায়, বাংলা ছোটগল্পে প্রথম অন্ত্যজ শ্রেণির উপর আলোকপাত করেছেন শৈলজানন্দ তাঁর 'মা' (১৩৩০) গল্পে, একজন সাঁওতাল যুবকের কুলি মুজুরে পরিণত হওয়ার কাহিনি বর্ণনার মাধ্যমে। কল্লোল গোষ্ঠীর লেখকদের থেকে দুই দশক পরে ঝাঁসির রাণী (১৯৫৬) নামক ইতিহাসাশ্রয়ী জীবনি গ্রন্থ লিখে বাংলা সাহিত্যে মহাশ্বেতা দেবীর আবির্ভাব। মহাকালের রথের চাকা যত এগিয়েছে, লেখিকার লেখনী শক্তি ততই ক্ষুরধার হয়েছে। 'ব্যাপক সামাজিক অভিজ্ঞতা ও সহানুভূতিতে' তার উপন্যাসের বিষয়বস্তুতে এসেছে বিপুল বৈচিত্রের সমারোহ। ইতিহাসচেতনা থেকে শুরু করে মধ্যবিত্ত জীবনের অন্বেষণ, আদিবাসী শোষণ ও বিদ্রোহ থেকে কৃষক ভাগচাষী, ভূমি আন্দোলনের প্রসঙ্গ এসেছে কালক্রমে। উপন্যাসের পাশাপাশি তিনি তাঁর ছোটগল্পগুলিতে রেখে গেছেন অন্ত্যজ ও আদিবাসী নারীদের জীবন যন্ত্রণার সারকথা, যেখানে নারীরা বিভিন্নভাবে শোষিত হয়েছে, নিপীড়িত হয়েছে,অত্যাচারিত হয়েছে। তাঁর 'দ্রৌপদী'(১৯৭৬), 'শিকার' (১৯৭৮),'বাঁয়েন', 'রুদালী', 'ধৌলি' প্রভৃতি গল্পের নারীরা যেমন শোষিত হয়েছে, তেমন সমাজের প্রতি রেখে গেছে সরব ও নিরব প্রতিবা্বসিত

মহাশ্বেতা দেবীর গল্পগুলির মধ্যে অন্যতম শক্তিশালী গল্প 'দ্রৌপদী'। সভ্য জগৎ ও তাদের নির্মিত আদিবাসী-অন্ত্যজ শ্রেণি শোষণের শোষণ-মিথের প্রতি বিদ্রোহ প্রকাশের মধ্য দিয়েই গল্পটির আঙ্গিক বিন্যস্ত হয়েছে। গল্পের মূল কেন্দ্রীয় নারী চরিত্র দ্রৌপদী। অনার্য সাঁওতাল উপজাতির বিদ্রোহের প্রতিনিধি। মহাজন কারবারী ও শোষক শ্রেণির প্রতিনিধি সূর্য শাহু ও তার ছেলেকে খুন করার অপরাধে সমস্ত পুলিশ ডিপার্টমেন্ট ও বিশেষ করে পুলিশ

ক্যাপ্টেন অর্জন সিং এর কাছে দ্রৌপদী মেঝেন ও তার স্বামী দুলন 'মোষ্ট ওয়ান্টেড'। গল্পে উল্লেখিত 'দুই তকমাধারী' পুলিশ ইয়ুনিফর্মের সংলাপে দ্রৌপদী সম্পর্কে জানা যায় ' দ - মোষ্ট নটোরিয়াস মেয়েছেলে। লং ওয়ান্টেড ইন মেনি.....'। ১৯৭১ সালের ক্যাপ্টেন অর্জন সিং এর প্রতিনিধিত্বে যৌথ বাহিনীর 'বাকুলি অপারেশনে' পুলিশের চোখে ফাঁকি দিয়ে পালিয়ে গিয়েছিলো দ্রৌপদী ও তার স্বামি দুলন। তাই দ্রৌপদী তার স্বামী পুলিশের কাছে কুখ্যাত অপরাধী রূপে গন্য। পরবর্তীতে স্বজাতি দুখীরাম ঘড়ারীর বিশ্বাসঘাতকতায় স্বামী দুলনের পুলিশের গুলিতে মৃত্যু হলেও দ্রৌপদী একাই সংগ্রাম একাই চালিয়ে যেতে থাকে। প্রলোভনের পথে পা দিয়ে একাই জাতির ও সংগ্রামের সহকর্মী সোমাই ও বধুনার বিশ্বাসঘাতকতায় দ্রৌপদীও বেশি দিন আত্মগোপন করতে পারে না। এক সময় তাকে পুলিশের জালে ধরা পরতে হয়।

এর পরে সেনানায়কের আদেশ মত দ্রৌপদীর উপর শুরু হয় অমানুষিক ও অমানবিক যৌন নির্যাতন ও ধর্ষণ। কারণ সেনানায়কের কঠোর নির্দেশ 'ওকে বানিয়ে নিয়ে এসো। ডু দি নীডফুল'। দ্রৌপদীকে সাধ্যমত বানিয়ে নিয়ে আসে সেনাগণ-

> 'তারপর এক নিযুত চাঁদ কেটে যায়। এক নিযুত চান্দ্র বৎসর লক্ষ আলোকবর্ষ পরে দ্রৌপদী চোখ খুলে, কি বিস্ময়, আকাশ ও চাঁদকেই দেখে। ক্রমে ওর মস্তিষ্ক থেকে রক্তাভ আলপিনের মাথা সরে যায়। নড়তে গিয়ে ও বোঝে এখনো ওর দুহাত দু খুঁটোয় এবং দু পা দু খুঁটোয় বাঁধা। পাছা ও কোমরের নিচে চটচটে কি যেন। ওরই রক্ত। শুধু মুখের ভিতর কাপর নেই ভীষণ তেষ্টা। ...বুঝতে পারে যোনিতে রক্তস্রাব। কতজন ওকে বানিয়ে নিতে এসেছিলো? ওকে লজ্জা দিয়ে চোখের কোল থেকে জল গড়ায়। ঘোলাটে চাঁদের আলোয় বিবর্ণ চোখের নিচের দিকে নামাতে নিজের স্তন দুটি চোখে পড়ে এবং ও বোঝে হ্যাঁ, ওকে ঠিকমত বানানো হয়েছে। এবার ওকে সেনানায়কের পছন্দ হবে। স্তন দুটি কামরে ক্ষত-বিক্ষত,বৃন্ত ছিন্নভিন্ন। কত জন? চার-পাঁচ-ছয়-সাত তারপর দ্রৌপদীর হুঁশ ছিলো না। '(পৃঃ ৩৮, মহাশ্বেতা দেবীর ছোটগল্প সঙ্কলন)

মহাভারতে পঞ্চপান্ডবের স্ত্রী দ্রৌপদীকে বিবস্ত্র করেছিলো দুঃশাসন, ধৃতরাস্ট্রের রাজসভায়। কিন্তু এই গল্পে দ্রৌপদী জোতদার -মহাজনী-শোষক সমাজের বিরুদ্ধে বিদ্রোহী আদিবাসী এক পার্থিব সত্তা। এক ঘন্টা ধরে অমানবিক যৌন নির্যাতন ও ধর্ষিত হবার পরেও বিদ্রোহী চেতনায় ভাস্বর দ্রৌপদীকে কিছুতেই দমিয়ে রাখা যায় না। উলঙ্গ ধর্ষিত দ্রৌপদী আরও বিভৎস হয়ে উঠে সেনা নায়কের কাছে। দ্রৌপদীর নরস্ত্র প্রতিবাদের সামনে ভিত হন সেনানায়ক পর্যন্ত-

> 'দ্রৌপদীর কালো শরীর আরো কাছে আসে। দ্রৌপদী দুর্বোধ্য, সেনানায়কের কাছে একেবারে দুর্বোধ্য এক অদম্য হাসিতে কাঁপে। হাসতে গিয়ে ওর বিক্ষত ঠোঁট থেকে রক্ত ঝরে এবং সে রক্ত হাতের চেটোতে মুছে ফেলে। দ্রৌপদী কুলকুলি দেবার মত ভীষণ, আকাশচেরা, তীক্ষ্ণ গলায় বলে, কাপড় পরাবি কেমন করে?মরদ তু? চারদিক চেয়ে দ্রৌপদী রক্তমাখা থুথু ফেলে বলে, হেথা কেও পুরুষ নাই যে লাজ করব। কাপড় মোরে পরাতে দিব না। আর কি করবি? লেঃ কাউটার কর্ লেঃ কাউটার কর্ -? দ্রৌপদী দুই মর্দিত স্তনে সেনানায়ককে ঠেলতে থাকে এবং এই প্রথম সেনানায়ক নিরস্ত্র টার্গেটের সামনে দাঁড়াতে ভয় পান, ভীষণ ভয়।'(পৃঃ-৩৯'(পৃঃ ৩৮, মহাশ্বেতা দেবীর ছোটগল্প সঙ্কলন)

প্রতিবাদ যদি সবাক কিংবা অবাক অথবা সোচ্চার কিংবা নিরুচ্চার যাইহোক না কেন কায়েমী শাসক দলের কাছে তা অবশ্যই মারাত্মক ভয়ের বস্তু। প্রিতবাদেই নির্মূল হয় শোষণ, শোষকের শোষণ ক্ষমতার সিংহাসন যায় টলে। যে উলঙ্গ, সোচ্চার প্রতিবাদ এই গল্পে দ্রৌপদি নামক আদিবাসী এক রমণী চরিত্রে লেখিকা তুলে ধরেছেন ঠিক তেমনি ভাবে লেখিকার 'শিকার' (১৯৭৮) গল্পেও আমরা পাই ওঁরাও আদিবাসী উপজাতির মেরী নামক নারী চরিত্রটিকে, যে কিনা সোচ্চার প্রতিবাদের প্রতিভূ। অবশ্য এই গল্পের বিষয়বস্তু ও প্রেক্ষাপট আলাদা, কিন্তু থিম একই। গল্পের কাহিনিতে মেরী ডাল্টনগঞ্জের আদিবাসী 'ওঁরাও' রমণী।তার জন্ম রহস্যের পিছনে রয়েছে সমাজ

বহির্ভূত, **অবৈধ** এক অস্ট্রেলিয়ান রক্ত। আদিবাসী কুরুডা গ্রামে একসময় সাহেবদের **'টিম্বার প্লান্টেশন'** ছিল, মেরির মা সেখানে কাজ করার সুবাদে ডিক্সন সাহেবের ছেলের সাথে পরিচয় হয় এবং তার ফলস্বরূপ অবৈধ **সন্তান** মেরীর জন্ম। পরবর্তীতে ডিক্সন সাহেব ও মেরীর বাবা অস্ট্রেলিয়া চলে গেলে সেই বাংলো কিনে নেন প্রসাদজী। কিন্তু মেরী ও তার মা কে তাড়াবার কথা না ভেবে প্রসাদজী নিজের সুবিধার কথা ভেবে দুজনকেই বাংলোতে রেখে দেয়। বস্তুতপক্ষে, মেরী দুর্দম, দুর্দান্ত, কর্মঠ ও সাহসী। তার যৌবন অনেক প্রেমিক পুরুষদের হাতছানি দিলে ও সে নিজের ইচ্ছায় বিজাতীয় এক মুসলিম ছেলের সাথে প্রেম্বন্ধনে আবদ্ধ হয়েছে। একদিকে যেমন মেরী ওঁরাও সমাজের রীতি-নীতিকে তোয়াক্কা করে না তেমনি অন্যদিকে অস্ট্রেলিয়ান সাহেবের ঔরসে জাত মেরীকে ওঁরাও সমাজ তাদের রীতি-নীতি থেকে তাকে অব্যবহিত দিয়েছে।

কিন্তু হঠাৎ কুরুডার বনাঞ্চলে হাজির হয় ঠিকাদার তশীলদার সিং। ব্যবসায়িক বুদ্ধি এই ঠিকাদারের বনাঞ্চলের শালের গাছ ধ্বংস করে কাঠের ব্যবসা তার। সেই সুত্র ধরেই তার কুরুডাতে আগমন। নিজে একজন বিবাহিত পুরুষ হওয়া সত্ত্বেও সে নারী দেহ লোভী এক মাংস লোলুপ পশু। অথচ মুখে তার সভ্য জগতের নীতিগত বুলি- 'সবাই সবায়ের মা - বোন! যে ভুলবে, তাকে ভাগিয়ে দেব।'(পৃঃ-৫০)। কিন্তু নিজেই এক বিকৃত কামনার ফাঁদে বন্দী। প্রসাদজীর বাড়িতে যেদিন প্রথম সে মেরির পরিচয় হয়, সেদিনই তার মধ্যে জেগে উঠে মেরীর দেহের প্রতি তার অতুগ্র কামনা। যে কোন মূল্যেই মেরীর সাথে সে দেহসম্ভোগ করতে চায়। সেই লক্ষ্যকে পূরণ করার উদ্দেশ্যে প্রথমদিকে মেরীকে বস্তুগত প্রলোভন দেখায়। কিন্তু মেরীর বলিষ্ঠ ও তেজী মনোভাবে তশীলদার সুবিধা করতে পারে না। কিন্তু তবুও সে নাছোড়বান্দা,বিভিন্নভাবে মেরীকে এর জন্যে বিরক্ত করতে থাকে। তাই বিরক্ত মনে মেরী একদিন রাজী হয়ে যায় তশীলদারের পূর্ব পরিকল্পিত স্থানে অভিসারের জন্য।

এখানেই লেখিকা এই গল্পের পরিসমাপ্তি টেনে দিতে পারতেন। কিন্তু লেখিকা তা করেননি। আসলে লেখিকার অভিপ্রায় ছিলো না। তিনি এই গল্পের নামকরণ করেছেন 'শিকার'। তার জন্যে তিনি গল্পে শিকার করার মত পরিবেশ সৃষ্টি করেছেন- ' পলাশ গাছ এখানে মাইলের পর মেইল। গাছ এনতুন কুঁড়ি আসে। তারপর একদিন পহানের ঘরে নাগারা বাজে। জানা যায়, হোলির দিন আদিবাসীদের যে শিকার কেলার নিয়ম আছে, এবার সে শিকার মেয়েদের। বারো বছর পুরুষেরা এ দিনে শিকারে যায়। তারপর মেয়েদের পালা। পুরুষদের মত তারাও বেরোয় বলোয়া -তীর -ধনুক নিয়ে। জঙ্গলে পাহাড়ে ছোটে। শজারু- খরগোশ- পাখি যা পায় তাই মারে। ...কেন ওরা শিকার করে, তা ওরা জানে না'(পৃঃ- ৫৫, মহাশ্বেতা দেবীর ছোটগল্প সংকলন)

বারো বছর পরে ওঁরাও সমাজে আজ পুরুষদের পরিবর্তে মেয়েদের শিকারের দিন। এই দিনের রাত্রিতেই তশিলদারের প্রতীক্ষিত স্থানে অভিসার করতে চেয়েছে মেরী। গল্পের প্রথমদিকে মনে হয় শিকারী তশীলদার ও শিকার মেরী। গল্পের পরিসমাপ্তি তা কিন্তু নয়, শেষে আমরা যা দেখতে পাই তা হলো শিকার তশীলদার,শিকারী মেরী। বহু প্রতিক্ষায় প্রতিক্ষিত তশীলদার দৈহিক মিলনের আস্বাদে যখন টগবগ করে ফুটেছে, তখনি তাকে মেরীর দা এর কোঁপে নিধন হতে হয়েছে। মাংসলোলুপ মানুষবেশধারী পশু তশীলদসারের নিধনকে মেরীর মনে হয় 'বড় শিকার'। তাই সে আনন্দদিত, পরিতৃপ্ত-

> 'কয়েক লক্ষ চাঁদ কাটল। মেরি উঠে দাঁড়াল। রক্ত? জামায়?কাপড়ে? নালায় ধুয়ে নেবে... মেরী বেরিয়ে এলো। নালার দিকে চলল। নালায় নেমে নগ্ন হয়ে স্নান করতে করতে ওর মুখ গভীর তৃপ্তিতে ভরে গেল। যেন পুরুষসঙ্গ করে অশেষ তৃপ্তি পেয়েছ ও।'(পৃঃ- ৫৮, মহাশ্বেতা দেবীর ছোটগল্প সংকলন)

নারী জাতির প্রতি অবমাননা ও মাংসলোলুপ পুরুষবেশী পশুর প্রতি মেরীর এই সশস্ত্র প্রতিবাদ অবশ্যই আইনের চোখে অপরাধ। কিন্তু জীবন যেখানে বিপন্ন সেখানে প্রতিবাদের স্থান অবশ্যই রয়েছে, তা সে নিরুচ্চার প্রতিবাদেই হোক, কিংবা সোচ্চার। শুধু তাই নয় সেই শিকার নিধন রাত্রিতেই ওঁরাও সমাজে মেয়েদের গানের ভাষায় অলক্ষ্যে উঠে এসেছে যুগপরবর্তী যুগান্তর প্রতিবাদের সংকেত-

'হে হরম্‌দেও,
এমন হোলি বছর বছর হোক-
এমনি শিকার বছর বছর করি-
মদ দিব তোমাকে
মদ দিব-' (পৃঃ-**৫৯** মহাশ্বেতা দেবীর ছোটগল্প সংকলন)

'দ্রৌপদী' ও 'শিকার' গল্পে কেন্দ্রীয় দুই আদিবাসী নারী চরিত্র দ্রৌপদী ও মেরী মধ্যে যে সোচ্চার ও সশস্ত্র প্রতিবাদ দেখতে পাওয়া যায় তা কিন্তু মহাশ্বেতা দেবীর অন্যান্য অন্ত্যজ শ্রেণির নারী চরিত্রগুলিতে পরিলক্ষিত হয় না। তারা ব্যাপকভাবে সমাজ বঞ্চনা ও নিদারুণ অত্যাচারের শিকার। এই রকমেই একটি গল্প হলো 'বাঁয়েন'। গল্পের বিষয়বস্তুতে লেখিকা এক অভিনব অথচ শাশ্বত মানবতাবাদের বিস্ফোরোণ ঘটিয়েছেন। গল্পের কাহিনিকে লেখিকা শুরু করেছেন অন্ধবিশ্বাস ও কুসংস্কারে আচ্ছন্ন এক গ্রামীণ পরিবেশের উপস্থাপনার মাধ্যমে। প্রধান নারী চরিত্র ডোম সমাজের চণ্ডী গ্রাম সমাজের চণ্ডী গ্রাম সমাজের অভিশপ্ত কুসংস্কারের অন্যতম বলিদান।

গল্পের শুরুতেই চণ্ডীবাঁয়েনের বর্তমান কালীন বাস্তব চিত্রকে লেখিকা তুলে ধরেছেন তারই ছেলে ভগীরথের দৃষ্টিতে-

> 'কখনো মনেও হয়নি চণ্ডী বাঁয়েন কারো মা হতে পারে , দূর থেকে দেখেছে ঘরের মাথায় লাল নেকড়ের ধ্বজা, মাঝে মধ্যে দেখেছে উদ্‌ভ্রান্তের মত ধানক্ষেতের আলধরে চৈত্রের চষা দুপুরে লাল কাপড় পরে কে যেন কাঠি দিয়ে টিন বাজাতে বাজাতে মজা পুকুরের দিকে যাচ্ছে, পেছনে একটা কুকুর।বাঁয়েন যখন তখন টিন বাজিয়ে সাড়া দিতে দিতে যায়।বাঁয়েন যদি কোন ছোট ছেলে বা পুরুষকে দেখে তখনি চোখের দৃষ্টিতে তাদের শরীর থেকে রক্ত শুষে নিতে পারে" । (পৃষ্ঠা- ৮১, মহাশ্বেতা দেবীর ছোটগল্প সংকলন)

শ্রেণি বিভক্ত সমাজের অন্ত্যজ শ্রেণিরা চিরকালেই অবহেলিত ও বঞ্চিত। ডোম নামক এক অন্ত্যজ শ্রেণীর নারী চণ্ডী বাঁয়েনের বিয়ে হয়েছিল ঐ একই গ্রাম সমাজের বাসিন্দা মলিন্দরের। পিতার কৌলিকবৃত্তির সূত্রে ভাগাড়ে শবদেহ সৎকারের কাজ করতে হয় চণ্ডীকে । কিন্তু, তার চেতনায় ও বোধগম্যতাই সে বুঝে উঠতে পারে না শ্রেণি বিভক্ত ডোম সমাজের সৎকারের কর্মকে সমাজের উচ্চ শ্রেণীর মানুষজন কেন ঘৃণার চোখে দেখে? তার ভাবনায় প্রতিফলিত হয় চিরন্তন শ্রেণি বিভক্ত সমাজের শাশ্বত, চিরচারিত অবহেলিত, সামাজিক বৈষম্য – বিভেদের রূপরেখা ও জ্বলন্ত প্রশ্ন- "তবে তাদের এত ঘেন্না করে কেন মানুষ ।" শবদেহের সৎকারের সূত্র ধরেই মলিন্দরের সাথে পরিচয় ও বিয়ে হয় তার। এক সন্তানের জননী হয় সে। কিন্তু একদিন অন্ধ কুসংস্কারে জরাগ্রস্ত ডোম সমাজের বিশ্বাসে হঠাৎ "চণ্ডী হয়ে গেল বাঁয়েন, নিষ্ঠুর নির্দয় শিশুহন্তা। "

আলোচ্য গল্পে লেখিকা সমাজ সচেতন মন বাস্তবতার পরিপন্থী । আজ এই একবিংশ শতাব্দীতে আমরা প্রায়ই সংবাদপত্রে লক্ষ্য করি ডাইনি অপবাদ দিয়ে, নারীর প্রতি অন্ধ কুসংস্কারে জরাজীর্ণ সমাজের অত্যাচার ও তার প্রতি বিভেদমূলক আচার-আঁচরণকে। গল্পে ডোম সমাজে যখন আবিষ্কৃত হয় চণ্ডী 'বাঁয়েনে' পরিণত হয়েছে অর্থাৎ শিশু হন্তারক তখনি চণ্ডীর বৈবাহিক জীবনে নেমে আসে শাস্তির খড়্গ। স্বামী,সন্তান পরিবার থেকে সমাজ তাঁকে বিচ্যুত করে সমাজের এককোণে, একঘরে করে রেখে দেয়। যেন সে আলাদা জগতের প্রাণী। নিয়মশাসন ও শৃঙ্খলের বেড়ি তার পায়ে পরিয়ে দেওয়া হয়। এমনকি নিজের স্বামী সন্তানের পরিচয় দিতেও চণ্ডীকে নিষেধ করা হয়। তাই তার ছেলে ভগীরথ জ্ঞানহওয়া অবধি তার মাতৃপরিচয় জানতে পারে না।

পিতার থেকে মাতৃপরিচয় উদ্‌ঘাঁটিত করে ভগীরথের হৃদয় বিচলিত হয়। মা চণ্ডী , সমাজ স্বীকৃত বায়েন হওয়া সত্বেও মাতৃ স্নেহের জন্য ভগীরথের হৃদয় ব্যাকুল হয়ে ওঠে। অনদিকে ভগীরথকে দেখে চণ্ডীর চিরন্তন মাতৃসত্ত্বা জেগে উঠেছে। যে সমাজ একদিন তাকে বলতে বাধ্য করেছিল "আমি বায়েন আমি ঘরের ছেলে ফেলে ,মরা ছেলেকে দুধ দেই, মরা ছেলে নিয়ে সোহাগ করি ? আমি বাঁয়েন "সেই একদিন মানব সমাজের কল্যাণ সাধনের

জন্য নিজের প্রাণ বিসর্জন দিয়েও রক্ষা করে 'ফাইভ আপ লালগোলা'মেলকে বৃহত্তর ক্ষতি সাধনের হাত থেকে। বৃহত্তর মানবকল্যাণ চেতনার উন্মেষ , বিসর্জিত জীবন চণ্ডীকে সমাজ ও পরিবারের প্রতি পুনরায় তাকে তার আসল পরিচয়ের আসল স্বীকৃতি ফিরিয়ে দিয়েছে । অন্ধবিশ্বাসী সমাজকে আবার বলতে হয়েছে চণ্ডী তাদের সমাজেরই অন্তর্ভুক্ত।

"বিডিও লিখতে লাগলেন । ভগীরথের চোখ দিয়ে জল পড়তে লাগল ....ভগীরথ গলা ঝেড়ে বলল-আজ্ঞা আমার নাম ভগীরথ গঙ্গাপুত্র।

বাপপূজা মলিন্দরের পুত্র। নিবাস ডোমপাড়া।
মা ঈশ্বরচণ্ডী গঙ্গাদাসী.....।
ভগীরথ বংশ পরিচয় দিতে লাগল। "(পৃষ্ঠা- ৯৩ মহাশ্বেতা দেবীর ছোট গল্প সংকলন)

ব্যাপক বৈপরীত্য সমাজিক অবস্থান ও শ্রেণি বিন্যাসের পরিপ্রেক্ষিতে 'রুদালী 'গল্পের কাহিনীকে লেখিকা বিন্যস্ত করেছেন। পৃথিবী সৃষ্টির আদিলগ্ন থেকে যে অসমতল সমাজ বিন্যাস বিধৃত হয়েছে পৃথিবীতে, সেই সমাজের সুরই এই গল্পে পরিলক্ষিত হয়। তাই একজন সমাজসচেতন লেখিকা তাঁর মনের ক্ষুরধার লেখনি শক্তি দিয়ে তিনি তুলে ধরলেন এক অমোঘ সত্য আলেখ্যকে। যেখানে এক শ্রেণি আর এক শ্রেণিকে শোষণ করবে নিংড়ে নেবে তার সমস্ত নির্যাস । আলোচ্য গল্পে দুসাদ নামক এক অন্ত্যজ শ্রেণির আলেখ্যতে আমরা এই শাশ্বত কথারই পুনরুক্তি দেখতে পাই। শনিচরী যে কিনা এই গল্পে অন্ত্যজ দুসাদ জাতীর নারীর প্রতিমূর্তি হয়ে দাঁড়িয়েছে, সেও দুসাদ জাতির পুরুষদের সঙ্গে সমানভাবে শোষিত। উচ্চবর্ণ রাজপুত জাতির মহাজনীয়ও শোষণে সেও বিপর্যস্ত । কলেরায় স্বামীর মৃত্যুতে অসহায় শনিচরী , সমাজের উচ্চবর্ণ নির্মিত শ্রাদ্ধ - শান্তি উপলক্ষে বাধ্য হয়ে মহাজন রামবতার সিং এর কাছ থেকে 'পাঁচ বছর ক্ষেত- বেগারি খেটে পঞ্চাশ টাকা শোধ করব'এই শর্তে টাকা তাকে ধার করতে হয়। অর্থাৎ শনিচরীকে বেঠবেগারী রূপে খাটাতে তার দারিদ্র ও সমাজ সমানভাবে দায়ী। শুধু একা শনিচরীই নয়, শনিচরীর খেলার বয়সের সাথি বিখনি কেও রাজপুত্র শাসিত সমাজে মহাজনীয় শোষণে শোষিত হতে হয়েছে, নিঃস্ব হতে হয়েছে। কালের গতির অগ্রগমনে স্বামী, ছেলেকে হারাতে হয়েছে শনিচরীকে । একমাত্র তার সহায় -স্বাবলম্বন ছিল নাতি হারোয়া। কিন্তু সেও ঠাকুমা শনিচরীকে ছেড়ে ম্যাজিসিয়ানদের দলের সঙ্গে পালিয়ে যায়। এরকম অবস্থায় নিঃসহায় বৃদ্ধা শনিচরীর সঙ্গে সাক্ষাৎ ঘটে বাল্যকালের সাথি বিখনির। জীবন সংগ্রামে উভয়েই সমানভাবে বিপর্যস্ত।ভবিষ্যৎ দিনযাপনের অনিয়শ্চতায় তারা দুলনের শরণাপন্ন হয়। দুলন তাদের কাছে ব্যক্ত করে, রুদালী নামক এক নতুন পেশার।রাজপুত শাসিত প্রবল প্রতাপ সম্পন্ন সমাজে রাজপুত ঘরের কোন ব্যক্তি মানুষের গঙ্গাপ্রাপ্তি ঘটলে রোদনের জন্য প্রয়োজন হয় রুদালীর। দুলনের বক্তব্যে স্পষ্ট হয় সেকথা-

"হাতি, ঘোড়া, মহিষবাথান, উপপত্নী, জারজ সন্তান, উপদংশ বা অন্য যৌনব্যাধি - 'বন্দুক যার জমি তার' বিশ্বাস সকলেরই অল্পবিস্তর আছে।..... এদের মানসম্মান রাখতে রুদালী ঔরত চাই।" রুদালীরা যত উচ্চস্বরে রোদন করে, ততই সেই রাজপুত ব্যক্তিমানুষের পার্থিব মহিমা কীর্তিত হয়, বর্ধিত হয়। অথচ অন্ত্যজ শ্রেণি শোষণে এই রাজপুত জাতি সিদ্ধহস্ত। কিন্তু এই রুদালী কারা? এর উত্তরে লেখিকা উল্লেখ করেছেন, যে সব নারীরা প্রবল প্রতাপ সম্পন্ন রাজপুত জাতির কাছে শোষিত হয়েছিল, বাধ্য হয়ে জন্ম দিয়েছিল এক এর পর এক রাজপুত জাতির জারজ সন্তানের, যাদের ঠিকানা হয়েছে 'রাণ্ডী খানা' নামক নিষিদ্ধ স্থানে, তারাই জীবিকার প্রয়োজনে, জীবন সংগ্রামে নিজেদের অস্তিত্বকে বজায় রাখার চুড়ান্ত প্রয়াসে দেহব্যাবসার পাশাপাশি তাদেরকে চয়ন করে নিতে হয়েছে রুদালী নামক এক অভিনব পেশাকে। সভ্য জগতে এই পেশা হাস্যকর হলেও তা বাস্তব সত্যি। যেখানে রাজপুত সমাজ শত অত্যাচার করলেও, শত অন্ত্যজ নারীকে রক্ষিতা করে জারজ সন্তানের জন্ম দিলেও, নারী পুরুষ উভয় লিঙ্গ নির্বিশেষে বেঠবেগারী খাটালেও আপরাধের মানদণ্ডে তারা বিবেচিত হয় না, বরঞ্চ তাদের মহিমাকে কীর্তিত করতে প্রয়োজন হয় রুদালীর। আলচ্য গল্পে এই পেশাকেই বেছে নিতে হয়েছিল শনিচরী ও বিখনি উভয়কেই।

এরপরবর্তী 'ধৌলি` গল্পে আমরা দেখতে পাই উচ্চবর্ণের রিরংসা ও তার ফলে অন্ত্যজ দুসাদ শ্রেণির এক নারীর সংকটময় জীবন কাহিনীকে। যেখানে রয়েছে বিশ্বাস-অবিশ্বাস, প্রেম ও বিশ্বাসঘাতকতার নিদারুণ চিত্র। কেন্দ্রীয় নায়িকার নামকরন অনুসারে গল্পের নামকরন করেছেন লেখিকা। কাহিনির প্রেক্ষাপট মানভূম, ঝাড়খণ্ড সংলগ্ন অঞ্চল। অন্ত্যজ দুসাদ জাতির ধৌলি ভালবেসেছিল উচ্চবর্ণ ব্রাহ্মণ মিশ্রিলালকে। শ্রেণিবিভক্ত সমাজে ধৌলি একথা জানত, নিম্নবর্ণের সাথে উচ্চবর্ণের পরিণয়কে কখনই শ্রেণি বিভক্ত সমাজ মান্যতা দেয় না। তবু মিশ্রিলালের প্ররোচনায় ও কপটতার জালে ধৌলি**কে** ধরা দিতে হয়।জৈবিক চাহিদার পরিণাম স্বরূপ তাকে গর্ভবতী হতে হয়। কিন্তু মিশ্রিলাল তাকে সামাজিক পরিচয় দিতে চাইলে, তার পরিবার প্রধান অন্তরায় হয়ে উঠে।কারন উচ্চবর্ণের বিকৃত কামনার বহ্নিতে অনেক অন্ত্যজ দুসাদ, গঞ্জু শ্রেণির নারীদেরকে আত্মহুতি দিতে হয়, জন্ম দিতে হয় জারজ সন্তানের। যেন সমাজের এক অলিখিত নিয়মে ও প্রতাপে অন্ত্যজ শ্রেণির নারীদের দেহসম্ভোগ করার ও অবৈধভাবে অন্তঃসত্ত্বা করার অধিকার সমাজের উচ্চবর্ণের পুরুষদের রয়েছে। তারা প্রতাপের দৌলতে অসংখ্য অন্ত্যজ শ্রেণির নারীদের 'রাণ্ডী' করে রাখতে পারে। গল্পে মিশ্রিলালের জননী কণ্ঠে ধ্বনিত হয় অন্ত্যজ শ্রেণির নারীদের সামাজিক অবস্থান- 'দুসাদ- গঞ্জু মেয়ের পেটে এ বংশের ছেলে আগেও হয়েছে।বয়েসের গরম ...' উচ্চবর্ণের পুরুষদের অসংযত কামনা ও তার ফলাফলে অন্ত্যজ নারীদের জীবন বিনিষ্ট হয়ে যাওয়ার ঘটনাকে উচ্চবর্ণের নারীরা বয়েসের গরম –এর সুনিদিষ্ট সংজ্ঞায় সীমাবদ্ধ রাখতেচায়।এই কারনেই মিশ্রিলালের মা ধৌলি **কে** মিশ্রিলালের স্ত্রী রূপে স্বীকার করতে চায়না, বরঞ্চ একজন খোরপোশ যুক্ত রক্ষিতা রূপেই দেখতে চায়। শুধু মিশ্রিলালের মা নয়, তার সমস্ত পরিবার তাদের সামাজিক অবস্থানের সম্পর্ককে মান্যতা দিতে অস্বীকার করে। এর জন্যে তারা ধৌলির কাছ থেকে দূরে সরিয়ে ধানবাদে মিশ্রিলালের বিয়ের প্রচেষ্টা করতে থাকে। মিশ্রিলাল প্রথম দিকে বিয়ে করতে অস্বীকার করলেও, পরবর্তীতে সে উচ্চবর্ণের আর পাঁচজন শান্ত ভাল ছেলের মতো বিয়ে করতে বাধ্য হয়। অন্যদিকে মিশ্রিলাল ধানবাদে চলে গেলে অন্তঃসত্ত্বা ধউলির জীবনে অস্তিত্বের সংকট ঘনীভূত হয়-

> 'ধৌলি সবই জানছিল। ও প্রতিবাদ জানাবার কথা ভুলেও ভাবে নি। দুসাদ মেয়েকে ব্রাহ্মণের ছেলে কি এই প্রথম নষ্ট করল? গ্রাম সমাজের বিচারে সব দোষেই ধৌলির। এতে প্রেম-ভালবাসার ব্যাপার থাকায় ধৌলি স্বসমাজের কাছেও ব্রাত্য। স্বসমাজের ছেলেদের সে আমল দেয়নি। না দিক। মিশ্রিলাল ওকে জোর করে খাটিয়ে নষ্ট করলে দুসাদরা ওকে ফেলত না। মিশ্রিবাড়ির ছেলেদের জারজ সন্তান দুসাদ-গঞ্জু-ধোবি টলিতে অনেক থাকে। এক্ষেত্রে ধৌলি স্বেচ্ছায় এগিয়ে গেছে। অমার্জনীয় অপরাধ।" (পৃষ্ঠা- ৪০৭, মহাশ্বেতা দেবী রচনা সমগ্র ১০)

সামাজিক স্বীকৃতি নয়, একজন রক্ষিতার জীবন যাপনের জন্য যতটা খোরপোষের দরকার সেই ততটুকু দাবীদারেরই প্রত্যাশা করেছিল ধৌলি। প্রাথমিকদিকে সে মিশ্রিলাল ও তার পরিবারের কিছু যৎসামান্য সাহায্য পেয়েছিল কিন্তু যত দিন এগিয়েছে খোরপোষের পরিমাণ কমতে কমতে এমন এক সময় আসে যখন মিশ্রিলালের পরিবার খোরপোষ দিতে সম্পূর্ণরূপে অস্বীকার করে। শুধু পরিবারের দিক থেকেই নয়, মিশ্রিলালের নিজের দিক থেকেও ধৌলির প্রাপ্তি হয়েছে কপটতা। জীবন যুদ্ধে নিজের অস্তিত্ব বজায় রাখার জন্য বাধ্য হয়ে দেহব্যবসায় নামতে হয়েছে তাকে। একদিকে নিজের অস্তিত্বের জন্য সংগ্রাম, অন্য দিকে নিজস্ব সমাজের প্রাপ্ত অসহায়তা –য় ধৌলি 'বেওসা রাণ্ডীতে' পরিণত হয়েছে। এর জন্য মিশ্রিলাল যতটা দায়ী তার থেকে অনেক বেশি দায়ী সমাজব্যবস্থা। - "ধৌলির মুখে এক দুর্বোধ্য করুণার হাসি ফুটে ওঠে । সে রকম হলে সে হতো ব্যক্তিজীবনে রাণ্ডী । এখন সে বেওসা রাণ্ডী হতে যাচ্ছে। তেমন রাণ্ডী একলা মানুষ । এখন সে যে রাণ্ডী হবে তা হবে তা এক সমাজের সদস্য । ব্যক্তির চেয়ে সমাজের শক্তি অনেক বেশি, আর যারা তাকে রাণ্ডী করে দিল , তারাই সকল সমাজ চালায়।"(পৃষ্ঠা- ৪১৭, মহাশ্বেতা দেবী রচনাসমগ্র- ১০)

যুগ পরিবর্তনের পাশাপাশি সমাজ সভ্যতায় এসেছে পরিবর্তন। একসময় নারীরা ছিল অন্ধকারের কাণাগলিতে, পর্দার আড়ালে, আজ তারা পুরুষতান্ত্রিক সমাজের বিরুদ্ধে সংগ্রামের মাধ্যমে অনেকটাই এগিয়ে গেছে। ইতিহাসের পাতায় ১৯১১ সাল যেদিন নারীরা তাদের প্রথম গণতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থায় ভোটাধিকারের ক্ষমতা অর্জন করেছিল। এর পরবর্তীতে 'নারীবাদ' নামক শব্দটির যতই অগ্রগতি ঘটেছে, ততই নারীশক্তির ক্ষমতায়ন সুদৃঢ় হয়েছে । সমাজ ও রাষ্ট্রের কল্যাণে নারীদের সপক্ষে গড়ে উঠেছে নারী শোষণ, নারীনির্যাতনের বিরুদ্ধে নানা আইন, গঠন করা হয়েছে নারীসমিতি, মহিলা কমিশন। নারীশক্তির সুদ্রিকরণের এই সকল শুভ প্রচেষ্টার অবদান অবশ্যই অনস্বীকার্য । কিন্তু অন্ত্যজ আদিবাসী নারীরা আজ কোথায় দাঁড়িয়ে ? সে কথাই মহাশ্বেতা দেবী বোঝালেন তা এই ছোটগল্পগুলির নারী চরিত্রের উপনিবেশ সৃষ্টি করে।

গ্রন্থঋণ –

১) দেবী , মহাশ্বেতা. *মহাশ্বেতা দেবীর ছোটগল্প সঙ্কলন,* ন্যাশনাল বুক ট্রাস্ট., নিউ দিল্লী: ১৯৯৩, মুদ্রণ
২) গুপ্ত ,অজয় সম্পা. *মহাশ্বেতা দেবী রচনাসমগ্র- ১০,* দে'জ পাবলিশিং., কলকাতা : ২০০৮, মুদ্রণ
৩) দেবসেন, সুবোধ. *বাংলা কথা সাহিত্যে ব্রাত্যসমাজ,* পুস্তক বিপণি., কলকাতা : ১৪০৫ বঙ্গাব্দ, মুদ্রণ